মাসিক

বর্ণালী

ম্যাগাজিন|সেপ্টেম্বর সংখ্যা

প্রকাশনায়ঃ ভূতত্ত্ব সাহিত্য সংঘ

বর্ণালী

সেপ্টেম্বর, ২০২০

অবসরে সাহিত্য চর্চা, দূর হবে বিষন্নতা

সম্পাদনায়

মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

সম্পাদনা পর্ষদ

মোঃ রাসেল সরকার

মুকীত আজমাইন শাহরিয়ার

মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

উপদেষ্টা

ইব্রাহীম আদহাম

প্রভাষক, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ

মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

অক্ষর বিন্যাস, প্রুফ রিডিং

মুকীত আজমাইন শাহরিয়ার

গ্রন্থসত্ত্ব ও প্রকাশনায়ঃ ভূতত্ত্ব সাহিত্য সংঘ

প্রকাশকালঃ সেপ্টেম্বর,২০২০

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

কবিতা

তুমি আজ হতাশার নাম/ মোঃ সায়মুম করিম
বড় ছেলে/ আনিছুর রহমান রাশেদ
বঙ্গবন্ধু/ কায়েস মাহাবুব
নিবেদন/ মহসিন রেজা
মনে পড়ে/ লায়না ইসলাম লাকী
প্রেমের সাঁজ/ কামরুজ্জামান বিবেক
দামি আর দামী/ লিটন আকন্দ
অপেক্ষা/ মোঃ আহনাফ শাকিল
দখিনা দুয়ার/ মারুফ আহমেদ

গল্প

জিও কাকু/ তনয় সরকার
আবার যাবো শৈশবে/ বিজয় পাল
আদর্শ শিক্ষক/ মুহাম্মদ নাইম আহমেদ
মুক্তি/ নিয়াজ মোর্শেদ হিমু

চিত্রকর্ম

নুরজাহান নুর

ইমু গুপ্তা

শাপলা আক্তার

জৈতা ইসলাম সাওলী

সম্পাদকীয়

এইতো, ক'দিন আগেও আকাশ শ্রাবণের মেঘে ঢাকা থাকতো। কিন্তু এখন? আকাশটা যেনো কাশফুলের মতো সাদা! এরপর ধবল জোছনার তো কোন তুলনাই হয় না। হ্যাঁ, শরৎ তো এমনি! বাংলা সাহিত্যের মহীরুহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও শরৎ নিয়ে প্রচুর কবিতা-গান রচনার মধ্যদিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও সুবাসিত করেছেন। তিনি বলেছেন-

‘শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাড়িয়ে মোহন অঙ্গুলি।
শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে-
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।’

আমাদের হৃদয়টাও শরতের আকাশের মত সাদা শুভ্র, জোছনার মত কমল হয়ে উঠুক এ কামনাই করি।

আর ভূতত্ব সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো "বর্ণালী" মাসিক ম্যাগাজিন এর দ্বিতীয় অনলাইন সংস্করণ। আপনাদের নিয়েই আমাদের আয়োজন। অবসরে সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করুন, দূর হয়ে যাক বিষন্নতা!

মোঃ রাসেল সরকার
সহকারী সম্পাদক,
বর্ণালী ম্যাগাজিন।

কবিতা

তুমি আজ হতাশার নাম

কৃষকের কষ্টের শ্রম দিয়ে করেছো তুমি,
মজুদ ব্যবসায়ীদের পকেট গরম।
তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়নের নিমিত্তে দিয়েছো তুমি,
নৈতিক তলানি।
লেখাপড়া ছাড়াই দিয়েছো তুমি,
পাশের ছড়াছড়ি।
সত্য খবরের নিমিত্তে দিয়েছো তুমি,
বাতাবি লেবুর ব্যাপক ফলন।
নৈতিকতার কারিগরের থেকে দিয়েছো তুমি,
লাঞ্ছনার হাতছানি।
নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনে দিয়েছো তুমি,
অজ্ঞাত বাহিনীর গুলি।

হে বাঙালির বাংলা তুমি নাকি
মুসলিম প্রধান দেশ??
কি চাওয়া উচিত ছিল আর কি চেয়েছো,
কি বাছতে গিয়ে কি বেছে নিয়েছো?

হে বাঙালির বাংলা,
তুমি আজ হতাশার নাম!!
নব্বই শতাংশ হত দরিদ্রের মাঝে,
সেরা মাথা পিছু আয়ের নাম।
বন্ধু রাষ্ট্রের নামে বিক্রি করছো,
জনস্বার্থের মান।।

মোঃ সায়মুম করিম
ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বড় ছেলে

এখন আমার ঈশ্বর পৌড়, মগজে অভিজ্ঞতা,
সুঠাম দেহ, বচনে যুবকের জোর,
কাঁধে রাষ্ট্রের পতাকা,
বুকপকেটে কাঁচা পয়সার ঝনঝনি।

ঈশ্বর,
আমায় ভাত দেয়, কাপড় দেয়, বিদ্যা দেয়,
কলিজা বেচে স্বর্গ কিনে দেয়,
ভাইকে দেয় খোলা কৈশোর,
বোনকে দেয় কড়া শাসন, রাজকন্যার আদর।
মাকে ঘটা করে তেমন কিছু দেয় না।
বছর ঘুরলে রংচটে যাওয়া মেরুন রংঙের শাড়িতে
দাম্পত্য ভালোবাসা এঁকে দেন।

ঈশ্বরের পায়ে জোড়াতালি লাগানো চটি,
কাঁটা বিধে গোপনে কাঁদে।
তিলেভরা পান্জাবি টি অনেক বছর ঈশ্বরের ঘাম
খেয়ে চিরঅমর হয়েগেছে।

আমার এখন এক কুড়ি এক,
এটাই সময় রাষ্টের পতাকা কাঁধে নেওয়ার,
রাষ্ট্রকে হাসানোর,
রাষ্ট্র হাসলে ঈশ্বর হাসবে, আমি হাসব।

আমি জেনে গেছি,
বড় ছেলে মানে মাটি কামড়িয়ে পরবাসে থাকা,
চলতে হোচট খাওয়া, পথ আকাঁবাকাঁ।
বড় ছেলে মানে, আধা পেট খেয়ে গলা অবধি
জল তুলে শান্তির ঢেকুর তোলা,ভালো আছি বলা।
আমি বড় ছেলে, ঈশ্বরের মত আমিও শিখে গেছি
প্রিয় মিথ্যে বলা।

আনিছুর রহমান রাশেদ
প্রথম বর্ষ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু

শোনো, হে নবীন
কৃষক, শ্রমিক, প্রবীণ,
টুঙ্গিপাড়ার এক ছোট্ট কিশোরের গল্প,
যেখানে লুকানো ছিলো স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন।

যাঁর কাঁধে উঠে দাঁড়ায়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের শির,
তিনি এক অসীম সাহসী, অকুতোভয় বীর।
যাঁর সাহসিকতা যেন বিশাল সমুদ্রের ঢেউ,
প্রতিবাদ আর দেশপ্রেমে সমতুল্য হবে না কেউ।

তিনি মানেই ৬৬'র বাংলার মুক্তির সনদ,
শোষণ, অত্যাচার, বৈষম্যে প্রতিবাদ আর অমত।
তিনি মানেই ৬৯'র মিথ্যা মামলার বিদ্রোহী কয়েদী,
পাকিস্তানি সামরিক শাসন, মার্শাল ল'র বিরোধী।

তিনি মানেই নিরঙ্কুশ বিজয়ে ৭০'র নির্বাচন,
বাঙালির অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী আগ্রাসন।
তিনি মানেই ৭ই মার্চের রক্তে আগুন ঝরা ভাষণ,
মুক্তির ডাকে পুরো জাতিকে একই আত্মায় বাঁধন।

তিনি মানেই সহচর, জাতীয় চার নেতা,
ডিসেম্বর ষোলোতে, রেসকোর্সের স্বাধীনতা।
তিনি মানেই হাজরো কাব্য, গল্প আর উপন্যাস,
তিনি মানেই পঁচাত্তরের ঘাতকদের দীর্ঘশ্বাস।

তিনি বঙ্গবন্ধু, পিপাসার্ত বাঙালির স্বাধীনতার তেষ্টা,
তিনি মহান রাষ্ট্রনায়ক, সোনার বাংলা গড়ার চেষ্টা।
চলো আজ সবাই মিলে,
একই কণ্ঠে গাই তাঁর গান,
তিনি আমাদের জাতির পিতা,
শেখ মুজিবুর রহমান।

কায়েস মাহাবুব সাকিব
২য় বর্ষ, ভেটেরিনারি এন্ড এনিমেল সাইন্সেস বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নিবেদন

শোনো অবুঝ মনের মেয়ে,
তুমি হাসলে এই হৃদয় হাসে!
আপন ভুবন স্বপন ভুলে
হাজার খুশির বাণে ভাসে!
শোনো অবুঝ মনের মেয়ে,
তুমি কাঁদলে এই হৃদয় কাঁদে!
মুক্তোদানার ন্যায় অশ্রুগুলো
এক নিখাদ মায়ায় বাঁধে!

তোমার মায়াবী চোখের পাতায় গাঢ় অভিমান জমে!
অবুঝ মনের গহীন কোণে অন্ধকার বিষাদ নামে!
আমার অপলক চোখের করুণ চাহনী,
বুঝো কি তুমি!
পড়তে পারো কতটা!
বুঝো কি তা কতটা দামী!

মনের গহীনে হৃদয় বাগানে
এক টুকরো গোলাপ তুমি।
তোমার কাজল চোখের মায়ার নেশায় আসক্ত
আমি!

আমার হৃদয় জুড়ে আছো তুমি,
আছো কল্পনায় মিশে।
এ জীবনে তুমি না হয় আমারই হলে,
তাতে বাধা কীসে!

তুমিহীন দিনগুলো, তুমিহীন ক্ষণগুলো বড্ড
বিষাদময়।
তুমিহীন সন্ধ্যার এই হৃদয় আকাশ গাঢ়
অন্ধকারময়!
ক্রমশ গাঢ় হয়, গভীর হয় তোমার কাজল চোখের
মায়ার নেশা।
খুব জানতে ইচ্ছে করে,
তা কি শুধুই মোহ, শুধুই অমূলক আশা!

শোনো অবুঝ মনের মেয়ে,
তুমি কাঁদলে এই হৃদয় কাঁদে।
মুক্তোদানার ন্যায় অশ্রুগুলো এক নিখাদ মায়ায় বাঁধে।
আমার হৃদয়জুড়ে আছো তুমি,
আছো কল্পনায় মিশে।
এ জীবনে তুমি না হয় আমারই হলে তাতে বাধা কীসে!

মহসিন রেজা,
ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, ৩য় বর্ষ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মনে পড়ে

আজ বহু কালের ব্যাবধান
তবু যেন কিছুই বদলায়নি
আজও তোমার কবিতা পড়ি
রাত্রিভর অথবা নিরবে একাকীত্বে।
তোমার কথা আজও মনে পড়ে
তখন এই মন-
খুঁজে পেতে চায় তোমাকে
জানি না তুমি কোথায়।
তুমি কি আজও কাঁদো আমার জন্য?
আজও কি ফুল নিয়ে অপেক্ষায় থাকো?
আমায় দিবে বলে।

আমি আজও তোমার জন্য কবিতা লিখি
তুমি চেয়েছিলে-
কবিতার মাঝে আমায় লুকিয়ে রাখবে বলে।
তুমি কি আজও অচেনা পথে পা বাড়াও?
তুমি কি দেখেছো ফুলগুলো
ঝড়ে পড়েছে কি না?
যে ফুলগুলোকে আমাদের
সুখের উৎস হিসেবে নির্বাচন করতে চেয়েছিলে!

সত্যি, তোমায় ভেবে
আজও আমার কষ্ট হয়,
কালো মেঘের শ্রাবণ দিনে
তোমাকে ভেবে এখনো কাঁদি।
তুমি তা জানতে,
এখনও কি জানো?
প্রেম বোধ হয় এমনই হয়।

আজ খুব বেশি দেখতে ইচ্ছে করে তোমাকে
কিন্তু তোমার সেই নির্মম শত্রু ঘড়িটা
প্রতি মূহুর্তে কেবল মুচকি হাসি হাসে,
আজ তুমি কোথায় আমি জানি না।
তবুও মনে হয় কিছুই বদলায়নি,
আগের মতই আছে।

তোমাকে এখনো দেখি
শীতের সকালে কুয়াশার মাঝে,
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বেলে,
আর চৈত্রের দুপুরে পথের ক্লান্তি শেষে।

মনে পড়ে, তাই-
তোমার স্মৃতির কাথা মুড়ে থাকি
তাতে অমৃত গন্ধ পেয়ে যাই তোমার,
জীবনের প্রত্যাশায়-
যতদিন বেচে আছি।।

লায়না ইসলাম লাকী
সিরাজগঞ্জ সরকারী কলেজ

প্রেমের সাঁজ

বর্ষায় মন উতলা হয় আমার।
পরিকল্পনা ছিল টিপ টিপ বৃষ্টিতে
দুজনে ভিজতে যাবো কালো যমুনার ধারে যাবো।
এ কথা শুনে প্রকৃতি আমাদের স্বাগত জানাতে
নতুন সাজে সজ্জিত হবার পরিকল্পনা করছে।

বর্ষার নতুন পানিতে গাছগুলো জীবন ফিরে
পেয়েছে।
কদম বনের নতুন সাঁজ তোমার চোখে পড়ে নি?

দুধসাদা কদম কলি বর্ষার সবুজ পাতার নৌকায়
করে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে
যমুনার কালো জ্বলে।
বেলি, জুঁই কিংবা কাঠগোলাপ কেউ চুপ করে বসে
নেই তোমার মনে দোলা দেওয়ার জন্য।
শুনছো তুমি হাসনাহেনার নতুন সংসার হয়েছে এই
বর্ষায় সে শিউলি বনে নিজের সংসার পেতেছে
একমাত্র তোমায় আমায় দেখবে বলে!!

বর্ষার মুষল ধারা তোমার মন কে দুলায়িত করতে পারবে তো?
নাকি তুমি শীতের রিক্ততায় কাবু হতে পছন্দ করো বেশি??

কামরুজ্জামান বিবেক
তৃতীয় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

দামি আর দামী

সব বিষয়ে যে লেটার
পেয়েছে
সে নিশ্চয়ই অনেক
দামি,
টেনেটুনে যে পাশ
করেছে
তারেও স্মরি আমি।
অভিনন্দন জানাই
তোমাদের দিয়ে গোলাপ
ফুল,
কম বেশি সবাই দামী
মানতে করো না ভুল।
পড়ার ক্ষতি হবে বলে
বাইরে যাওয়া বারণ,
একটা পর্দাই যখন
রুমের দেয়াল,
হয় পড়ার ক্ষতির
কারণ।

জন পাঁচেক মাস্টার
দিত,
ভালো ফল যাতে হয়,
ছোটদের পড়াতে হবে
এটাতো পড়ার বাইরে
নয়!
ঘুম ভাঙেনি,চোখ কচলে
কারও কোচিংএ হয়েছে
যেতে,
বাবা গিয়েছে ইটের
ভাটায়, তুই একটু যা
ক্ষেতে।
স্কুল শেষ দুপুরে খেয়ে
কেউ দিয়েছে ঘুম,
ঘুমাস নে বাবা মাঘ
ফাল্গুনে ধান লাগানোর
মৌসুম।
বিকালে কারও স্যার
এসেছে, মা দিয়েছে চা,

বাজারটা যা করে আন
বাবা দেরি হলে কিছু
পাবি না।
গোঁধুলি কারও কেটেছে
হেঁটে কেউ গিয়েছে
ছাদে, দায়িত্বের মাঝে
বুঝে নি সে পা দিয়েছে
ফাঁদে।
সন্ধ্যায় ও পড়েছে
একেলা তার নিজের
শান্ত কক্ষে,
এদিকে সাথে বসেছে
আরও তিনটা পড়াতে
হবে প্রত্যেককে।
"পড়া ছাড়া কিছু করাই
নাকি?" মা বলবেন
রেগে,
সারাদিন কত কাজ
করেছিস আর পড়িস
না জেগে।
ভালো ফল করেছো
যারা সব সুবিধা পেয়ে,
একটু খারাপ করেছে
যারা ক্ষুদ্র নয় তাদের
চেয়ে।
অভিনন্দন পাবে সবাই
যারাই সফলকাম,
গোবরে পদ্ম হয়েছে
যারা তাদের জানাই
প্রণাম।
বিফল হয়েছে যারা
ফেলে দেবার তো নয়,
ঘুরে দাঁড়াও, ভুলো
নাকো
পরিশ্রমীরাই সফল হয়।

লিটন আকন্দ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

অপেক্ষা

তুমি বৃষ্টি হয়ে ফিরে এসো
আজ ভিজিয়ে দাও আমায়,
শুন্য হৃদয় পূর্ণ হউক
তোমার অফুরন্ত প্রণয়।
রং তুলিতে আঁকতে পারিনি
তোমার চাঁদ মুখের হাসি,
হৃদয় মাঝে রেখেছি হায়
তোমার অনন্য প্রতিচ্ছবি।
তোমায় ছুইতে ব্যর্থ আমি
হেটেছি অনেকটা সারণি,
তোমার জন্যই আজো বসে
অপেক্ষার শেষ হবে জানি।
তোমার মাঝে দেখি আমায়
অনুভবে তুমি থাকো যেন,
আমার নিঃশ্বাসের আনাগোনা
তোমার চরণ অবিরত।

মো: আহনাফ শাকিল (সেনা) চৌধুরী
নীলফামারী

দখিনা দুয়ার

নিঃসঙ্গ তারাদের মতো
একাকিত্বে আজ অসহায়ত্ব নেমেছে মগজে,
দুপাশে-চারিদিক।
দখিনা দুয়ারে বসন্তের বাতাস আসে রিক্ততার;
কৃষ্ণচুড়ার প্রথম প্রহর যেন,
আমার রক্তাক্ত শরীরে আঁকা
তীব্র প্রতিশোধের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।
ক্রমাগত পুড়ছি,দাবানলে ছাই হয়ে উড়ছে
আমার পুড়ে যাওয়া ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়,
অ্যাকুয়াস হিউমার গলে মিশছে
ক্ষয়ে যাওয়া দগদগে মাংসে,
রক্তে আমার সমস্ত চেতনায়।
কি বিভৎস এ বেঁচে যাওয়া!
যুদ্ধের মতো মরে-পুড়ে ফেরা; মৃত্যুর আগে পাখিরা
যেমন মরে, আমার নিঃশ্বাসে বাঁচা ও দখিনা দুয়ার
যেন নরকের এক জ্বলন্ত ভাগাড়।

মারুফ আহমেদ
৪র্থ বর্ষ, লোক প্রশাসন বিভাগ,
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়।

গল্প

জিও কাকু

ইমনের স্কুলে আজ থেকে গরমের ছুটি শুরু হয়ে গেছে। ইমন ও তার বন্ধুরা বাড়ি ফেরার পথে প্ল্যান করতে লাগল কোথায় যাওয়া যায়। ইমন তাই তার বন্ধুদের বলল যাতে বিকালে সবাই বৈঠকে দেখা করে।

বিকাল ৪.০০ টা। ইমন ও তার বন্ধু শফিক আর রানা বৈঠকে হাজির। সবার চোখে মুখে চিন্তার ছাপ। সবাই সবার মন মতে জায়গার নাম বলছে। কিন্তু কোনো জায়গাই যেনো জমছে না। হঠাৎ ইমন বলে উঠল, "জিওকাকু"। সবাই অবাক হয়ে বলল জিওকাকু কে?

ইমন বলল, আমার দূর সম্পর্কের ছোটো কাকু। যিনি অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে জিওসায়েন্স এ পিএইচডি করছেন। আমি মজা করে জিওকাকু ডাকি।

শফিক বলল, তা তো বুঝলাম কিন্তু এখন কাকার বাসায় গিয়ে কি করবি?

ইমন বলল,

-আরে শফিক তুই তো জানিস না কাকার বাসায়

যে কি মূল্যবান জিনিস আছে!
-কি আছে?
-কাকার বাসায় আছে রকস মিউজিয়াম।
-রকস মিউজিয়াম! সেটা কি?
-আরে রকস মিউজিয়াম হল শিলা জাদুঘর। যেখানে নানা রকম পাথর ও মূল্যবান খনিজ পদার্থ সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশে শুধু পঞ্চগড় এই মিউজিয়াম দেখতে পাবি। আর পাবি আমার কাকার বাসায়। কাকা ব্যক্তিগত ভাবে তা সংরক্ষণ করেন। কাকা এখন বাংলাদেশে আছে তাই মিস না করতে চাইলে চল।
সবাই আনন্দের সাথে রাজি হল।
ইমন বলল, তোরা আজকের মধ্যে তৈরি হয়ে নে। আমরা আগামিকাল সকালেই রওনা হব। আমি কাকাকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমরা আসছি।

ইমনের কাকার নাম জাহের চৌধুরী। দেখতে শ্যামলা, মোটামুটি গড়নের। উনি প্রায়ই মাথায় একটা সাহেবী টুপি ও চোখে গোল ফ্রেমের চশমা পরে থাকেন। আর ঘরে বেশির ভাগ সময়ই আতসী কাচ নিয়ে নানা রকম পাথর পর্যবেক্ষণ করেন।

আজ সকাল থেকেই জাহের সাহেব একটু ব্যস্ত। হাতে আতসী কাচ নিয়ে বসে পড়েছেন। হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। জাহের সাহেব না উঠেই বলে উঠলেন, ইমন ভিতরে আয় দরজা খোলা। ইমন খুব বেশি অবাক হল না কারণ ইমন তার কাকার খুরধার বুদ্ধি সম্বন্ধে আগে থেকেই অবগত। তাও ইমন বলল,

-কিভাবে বুঝলে কাকা এখন আমি এসেছি?

-তোর কলিং বেল দেয়ার ধরন দেখে। একসাথে দুইবার দিবি,থামবি। তারপর আবার তিনবার দিবি। এটা এক ধরনের প্যাটার্ন। আর তুই গতকাল বললিও যে আজ আসবি তাই বুঝতে অসুবিধে হল না।

ইমন ও তার কাকা দুজনেই মুচকি হাসল।

ইমন বলল,

-দেখো কাকা আমার সাথে আমার দুই বন্ধুও এসেছে। আমরা এই ছুটিতে অন্য কোথাও যায় নি। শুধু তোমার মিউজিয়াম দেখতে চলে এসেছি।

জাহের সাহেব বললেন,

-ঠিকই করেছিস রে। আমি কয়েকদিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া চলে যাব।

তোদের সাথে দেখাও হয়ে গেল। আর মিউজিয়াম এ তোদের একটা বিশেষ জিনিসও দেখাব।
ইমন বলল চলো কাকা তারাতাড়ি মিউজিয়াম এ চলো।

ইমন ও তার বন্ধুরা রীতিমতো অবাক হল মিউজিয়াম টা দেখে। কত সুন্দর ও বাহারি রংয়ের পাথর।
তারপর ইমন ছোটোকাকা কে বলল কাকা তোমার ঐ বিশেষ জিনিসটা কোথায়?
জাহের সাহেব তারপর একটা আংটি নিয়ে আসলেন। যেটা দেখে ইমনের তো চক্ষু চড়কগাছ। এত সুন্দর আর ঝকমকে পাথরে তৈরি আংটি ইমন জীবনে দেখে নি।
জাহের সাহেব বললেন,
-বলতো এটা কিসের তৈরি?
ইমন বলতে পারল না। শুধু এটা পড়ার জন্য তার মন ব্যকুল হয়ে উঠল।
-এটা ডায়মন্ড রিং বুঝলি। ডায়মন্ড বা হীরে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু। তুই যে আংটিগুলো পড়ে আছিস এগুলোও ধাতুর তৈরি। তোর টা সম্ভবত ট্যাল্ক (talc) ধাতুর তৈরি। তুই

আংটি পড়তে ভালোবাসিস। তাই তোকে এটা দেখানো। এটা আমি আমাদের ইউনিভার্সিটির মিউজিয়াম কালেকশন থেকে আবেদন চেয়ে নিয়ে এসেছি আবার জমা দিতে হবে।
এবার ইমন তার মনের অনেকক্ষণের ব্যকুলতা প্রকাশ করে বলল যেন কাকা একদিনের জন্য আংটিটি ইমনের কাছে রাখতে দেয়।
অবশেষে অনেক বুঝানোর পর কাকা রাজি হল। ইমন ও তার বন্ধুরা খুব আনন্দের সাথে বাড়ি ফিরে এলো। ইমন তার বন্ধুদের থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় ফিরল।

রাত ১ঃ৩০,
ইমনের হাতে ডায়মন্ড রিং। ছোটোকাকা তাকে এটা পড়তে নিষেধ করেছে। কিন্তু ইমনের মনে তীব্র ইচ্ছে জাগছে একবার এটা আঙুলে পড়ার। আবার কাকার কথাও মনে হচ্ছে। এভাবে আংটি হাতে নিয়েই ইমন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু সকালে উঠেই ইমনের মাথায় হাত। সে অনেক খুঁজেও আংটি পেলো না। তন্নতন্ন করে সে বাসার সব জায়গা দেখেছে। অস্থির হয়ে উঠল সে। কাঁদতে কাঁদতেই সে কাকার বাসায় গেলো এবং আংটি খুঁজে না

পাওয়ার কথা বলল। জাহের সাহেব ও প্রথম হকচকিয়ে গেল এবং ইমনের সাথে তার বাসায় যাবে এমন সময়ই ইমনের এক আঙুলের দিকে তার নজড় গেলো। তারপর তিনি মুচকি হেসে ইমনকে তার দিকে টেনে নিয়ে জানালার পাশে সূর্যের আলোতে ইমনের হাত এগিয়ে দিলো। হাত এগিয়ে নিতেই একটা আলোর ঝলকানি ইমনের চোখে পড়ল। ইমন তার হাতে সেই আংটি টি দেখতে পেলো এবং বিস্মত হলো। কিছুতেই বুঝতে পারল না কিভাবে তার হাতে আংটিটা আসল। তখন জাহের সাহেব বুঝিয়ে বলল কি ঘটেছে। তুই নিশ্চয়ই ঘুমানোর আগে আংটি নিয়ে বসেছিলি এবং পড়বি কি পড়বি না ভাবছিলি আর ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়লি। তুই কি জানিস ঘুমালে আমাদের সচেতন মন চিন্তা করা বাদ দিলেও অবচেতন মন সজাগ থাকে এবং অনেক সময়ই আমাদের অবচেতন মনের চিন্তাগুলোর প্রভাব আমাদের শরীরের উপরে। তুইও অবচেতন মনেই আংটি পড়েছিস। আর তোর হাতে আগে থেকেই এতো আংটি তাই খেয়াল করিস নি। তাই ভাবলি হারিয়ে গেছে বা চুরি হয়ে গেছে।

এসব শোনে ইমন গদগদ হয়ে বলে উঠলো, জিওকাকু, তুমি গ্রেট। আমি তো ভয়ই পেয়ে গেছিলাম।

তারপর ইমন ও তার জিওকাকু দুজনেই হেসে উঠলো এবং ঐ আংটির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো। সূর্যের আলোতে কি সুন্দর ঝলকানিই না দিচ্ছে আংটিটা।

তনয় সরকার
২য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবার যাবো শৈশবে

জীবন যেন পদ্মপাতার একবিন্দু শিশির। জীবনের এই চিরন্তন সত্যকে উপেক্ষা করিয়া ঐ নীল সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতোই তীব্রবেগে এগিয়ে চলে এ জীবন। স্বপ্নগুলো যেন আকাশের ঐ রংধনুর মতোই।

শ্রাবনের কোনো এক সায়হ্নে যখন মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল, হৃদয় ছেয়ে গিয়েছিল একাকিত্বের কালো মেঘে তখন একলা বসিয়া জীবনের প্রতিটা অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতেই অন্তরচক্ষু একটু পিছনে ফিরে তাকাল। চোখের পাতায় ভেসে উঠল সেই স্মৃতিময় শৈশব। সেখানে ছিল বৃষ্টিতে ভেজার আনন্দ, ছিল কাদার ভিতর গড়াগড়ি খাওয়ার আনন্দ। বৃষ্টি পড়তেই যেন বাতাবিলেবু দিয়ে ফুটবল খেলার ধুম লেগে যেত। ফুটবল খেলা শেষে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে পড়া, সে তো এক স্বর্গীয় অনুভুতি। বর্ষার নদীতে চালুনি দিয়ে মাছ

ধরার আনন্দও বা কম কিসে? আর শৈলেন দাদুর বাতাবিলেবু গাছের বাতাবিলেবু চুরি করতে গিয়ে ধরা খাওয়ার পরে মায়ের বিনামূল্যে বকুনির সেই পরম তৃপ্তি, শৈশব ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? অবশ্য কানমলা খেয়ে কান দুদিন লাল থেকেই যেত।

কোনো এক বৃষ্টির দিনে স্কুলফেরার পথে কচুর পাতা দিয়ে ছাতা বানানোর বুদ্ধিটা একমাত্র শৈশবেই আসে। কলাপাতাও ছিল তখন উৎকৃষ্ট মানের ছাতা। লম্বা কলাপাতার নিচে দুই বন্ধু সামনে পিছনে টানাটানি করতে করতেই পিচ্ছিল রাস্তায় কাউকে না কাউকে পড়ে যেতেই হতো। সময়টা যেন বাড়ি, খেলার মাঠ আর স্কুলেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। নৌকা নিয়ে বিলের মাঝখানে হারিয়ে যাওয়াটাও একটা দারুন সময়। তখন নৌকায় করে বিলের একদিক থেকে অন্যদিকে যাওয়ায় যে কি সুখ, কি আনন্দ ছিল তা হয়ত ওই শাপলা ফুল গুলোও বুঝতে পারত। এই আনন্দই ছিল বুঝি তাদের প্রস্ফুটিত হওয়ার কারন। খুশিতে যেন ওরা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দুলতে থাকে। ওদের সাথে নিয়েই কর্দমাক্ত পথে

হেঁটে বাড়ি ফিরে আসা হতো। পথের ঐ কাদাও যেন বন্ধুত্ব করতে চায়। তাইতো ওরাও কাছে টেনে নেয় আমাদের। ওদের ডাকে সাড়া দিয়েই হয়ত পড়ে যেতাম কাদার ভিতর।

তখন যে বর্ষা শেষে শরৎ আসার সময় হয়ে গেছে তা বুঝিয়ে দেয় বাড়ির পাশের শিউলি গাছটা। গাছে তখন কুড়ি আসতে শুরু করে। কিছু দিন পরে সকালবেলা যখন দেখা যায় যে শিউলি তলা ফুলে বিছিয়ে আছে, মনে হয় শিউলি গাছটা যেন ভাত রান্না করে মাটিতে ছড়িয়ে রেখেছে। শিশির ভেজা ঐ শিউলি ফুল কুড়ানোই ছিল তখন প্রতিদিন সকালের কাজ। কোনো কোনো দিন ফুল কুড়িয়ে মা কে বলতাম, এই দেখ কত ভাত। আজ আর তোমার রান্না করা লাগবে না। তখন দেখা যায় মায়ের ঠোঁটের কোনে একরাশ হাসি। এভাবেই হঠাৎ করে শরৎ চলে যায়।

হেমন্ত আসতে না আসতেই মনে পড়ে যে এবার তো চড়ুইভাতি করা হলো না। ভাইবোন আর বন্ধুদের নিয়ে শুরু হয়ে যায় চড়ুইভাতির আয়োজন। যার যার বাড়ি থেকে চাল, ডাল,

তরিতরকারি নিয়ে কোনো এক খোলা জায়গায় যে খিচুড়ি রান্না করা হয় তার স্বাদ যেন আজীবনই মুখে লেগে থাকার মতো। এক কথায় চড়ুইভাতি মানে আনন্দ, হৈচৈ আর অনেক অনেক মজা।

কিছুদিন পর থেকেই শীতের আমেজ চলে আসে। চারিদিকে শুরু হয় খেজুর গাছ কাটা। খেজুরের পাতা দিয়ে মা পাটি বুনতো। সেই পাটির উপরই রাতে হারিকেন জ্বালিয়ে বই পড়া ছিল দৈনন্দিন কাজ।
কনকনে শীতের ভিতরেও মাথার ভিতরের দুষ্টবুদ্ধি গুলো বেশ রয়েই যায়। গাছি যখন খেজুরের রস পাড়তে গিয়ে দেখতো যে রস নেই, তখন আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে হাসতাম আর আমাদের উদরের দিকে তাকাতাম। কারন রস তো এই উদরেই আছে এখন। চুরি করা খেজুরের রস যেন একটু বেশিই মিষ্টি লাগত। কারন রসের সাথে মিশে থাকত আনন্দ। যে সে আনন্দ নয় একেবারে চুরি করার আনন্দ।

আর শীতের সকাল মানে ছিল তো খড়, নাড়া দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাস্তার ধারে আগুন

পোয়ানোর মজা। তারপরে পিঠেপুলি তো মাঝে মাঝেই বানানো হতো বাড়িতে। পিঠাগুলো মনে হয় চুলার উপর থেকেই আমাকে ডাকত। তাইতো আগুন পোয়ানোর বাহানায় চুলার পাশে বসেই পিঠা খাওয়া, এতো অতিসাধারণ ঘটনা। তখন কনকনে শীতে আমরা শীতের পোশাক পড়লেও গাছগাছালি গুলো পাতা ঝরিয়ে কেমন যেন আলগা থাকে। বড়ই অবাক লাগত। ওদের কি শীত নেই?

স্কুলের বড় বড় দুইটা কৃষ্ণচূড়া গাছের ঐ বড় বড় লাল ফুল গুলো বুঝিয়ে দিত এবার তবে বসন্ত এসেছে। আমরা যখন কৃষ্ণচূড়া ফুল কুড়াতাম তখন কৃষ্ণচূড়ার ঐ মগডালে বসে কোকিল পাখিটা কুহু কুহু করত। ওর মনেও হয়ত বসন্ত এসেছে। স্কুলে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া ফুল কুড়িয়ে ব্যাগ ভর্তি করাটাও ছিল অন্য একটা কাজ।

কিন্তু মনে হতো প্রকৃতি যেন আবার ক্ষেপে উঠেছে। গ্রীষ্ম এসেই তার রুদ্রানী রূপ ধারন করেছে। মুখে তার আগ্নেয়গিরি, চোখে ভয়ঙ্কর ঝলকানি আর হাতে যেন অগ্নি তরবারি। চারিদিক

যেন ঝলসে যায়। তবুও আমাদের পরাস্থ করা অত সহজ নয়। আমরা বাড়ির পাশের আমবাগানের ছায়ায় দিব্যি পাটি পেতে বসে থাকতাম আর ছোট্ট আমের গুটি কুড়াতাম। সন্ধ্যার কালবৈশাখী ঝড়ের পরে আম কুড়ানোর সুখ আর কোথায় আছে? তখন তো আবার চারিদিকে শুধুই ফলের সমাহার। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু ইত্যাদি। গ্রীষ্মের পুরো ছুটিটাই কেটে যায় আমতলা, জামতলা আর লিচুতলায়।

প্রকৃতির চঞ্চলতা ফেরাতে আবার বর্ষা আসে। ক্ষণে ক্ষণেই আকাশে কালো মেঘ জমে, মেঘ ডাকে। শৈশব নামক ঐ নীল পদ্মের উপর ই যেন বর্জ্যপাত হলো। অকস্মাৎ বিকট শব্দে সাঙ্গ হলো শৈশব কল্পনা।

এখন দিবানিশি ঘরে বাল্ব জ্বলে, নেই সেই হারিকেন। আছে আমোদপ্রমোদ, নেই সেই চড়ুইভাতির সুখ। ফুল মানেই এখন গোলাপ আর রজনীগন্ধা, হারিয়ে গেছে সেই শিউলি ফুল কুড়ানোর সোনালী দিনগুলো। নদীর উপর ব্রীজ

তৈরী হচ্ছে, কোথায় সেই ডোঙা আর নৌকা? এখন নেই সেই বৃষ্টির দিনে কচুপাতা কে ছাতা বানানোর আনন্দ।

তাই এখনও শ্রাবনের এক পশলা বৃষ্টির পর যখন ঐ আকাশে রংধনু ওঠে, ওই রংধনুর মাঝে আমি দেখতে পাই আমার সেই সোনালী শৈশব।

বৈশাখের সামান্যতম ঝড়েও এ মন আমার পৌঁছে যায় আমতলায় পাকা আম কুড়াতে। খেতে বসলে ভাতগুলোর দিকে তাকাতেই মনে পড়ে যায় শিউলী গাছটার নিচে ছড়িয়ে থাকা ফুলগুলোর কথা। এখন তো সেই শিউলি গাছটা ও নেই। আমি হারিয়েছি আমার শৈশব আর শিউলি গাছটা হারিয়েছে তার জীবন।

একাকিত্ব যখন হৃদয় ছেয়ে যায় তখনই ভাবি আবার যদি ফিরে পেতাম আমার সেই সোনালী সুখের শৈশব! এ মন যেন বারবার বলে ওঠে " আবার যাবো শৈশবে "এ যেন এক দিবাস্বপ্ন"।

বিজয় পাল
প্রথম বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আদর্শ শিক্ষক

সেদিন ম্যাচ থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, পরিক্ষা শেষ বলে। অনেক দিন হলো বাড়ি যাই না। তাই মনে অনেক আনন্দ হচ্ছিল। শেরপুর হতে সোনামুখী আসলাম CNG তে। আর সোনামুখী থেকে বড়ির উদ্দেশ্যে উঠলাম বাসে। আর সেই বাসের মধ্যেই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও শ্রেষ্ঠ শিক্ষা পেলাম।

আমি যখন ক্লাস নাইন-টেনে তারাকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তাম, তখন বাসে করে আসা যাওয়ার সময় তাকে কলেজে যেতে দেখতাম। তিনি আর কেউ নন, RIM ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক। আমাদের স্কুলের পাসেই ছিল সেই কলেজ।

যাই হোক, বাসে করে বাড়ি তে আসার পথে প্রথমে কলেজ, তারপর স্কুল। কলেজের কাছে বাস থামতেই তিনি বাসে উঠলেন। বাসে যথেষ্ট পরিমান

ভির ছিলোনা। আমি বাসের পেছনের আগের ছিটে বসা ছিলাম। তিনি এসে ঠিক আমার সিটের বাম পার্শ্বের সিটে বসলেন। আমি বসে বসে ভাবছিলাম কখন যে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছাব। বাস যখন সিমান্ত বাজার এসে পৌঁছাল তখন কয়েকটা মহিলা উঠলো, কিন্তু তাদের বসার সিট হলো না। ঠিক সেই মহূর্তে বাসের কনট্রাকটর একজন হিন্দু মহিলা ও তার কিশোরী মেয়ে কে বাসের পেছনের অংশে আসতে বললো। হটাৎ সামনে তকিয়ে দেখি অনেক লোক উঠে গেছে, যেন দাঁড়ানোর জায়গা নেই! তাদের মধ্যে একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। তিনি শুরু থেকেই হাকা হাকি করছিলেন যে, বসার সিট না হলে তিনি নেমে যাবেন। কনট্রাকটর সাহেব তাকে কোন রকমের পেছনে পাঠিয়ে, সেই প্রভাষক স্যারের কাছে বসিয়ে দিল। কিন্তু হিন্দু মহিলা ও তার মেয়েকে দড়িয়ে থাকতে দেখে প্রভাষক স্যার সহ্য করতে পারলো না। তিনি সিট ছেড়ে দিলেন এবং তিনি দাড়িয়ে হিন্দু মহিলাকে বসতে দিলেন। কিন্তু কন্ট্রাক্টর বলতেও পারছেনা, সইতেও পাড়ছে না যে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক কে উঠে কিশোরী মেয়ে টাকে বসতে দিতে। এদিকে বাস ভর্তি লোকের চাপাচাপিতে

কিশোরী মেয়েটি পড়েছে বিপাকে। এমতাবস্থায় আমার বাড়ি যাবার আনন্দ মূর্ছা গেল। আমি সিটে বসে লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম। সিটে বসে আরামে বাড়ি যাবার বাসনা ত্যাগ করলাম। আমি প্রভাষক স্যারকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে হতবাক হয়ে গেলাম। আমি আর এক মূহুর্ত বসে থেকতে পারলাম না। কোন এক কারণে হয়তো পরিচিত কার সাথে কতা বলার জন্য প্রাইমারী স্কুলের স্যারটি উঠে পেছনে গেলে অমনি কিশোরী মেয়েটি পুরুষ মানুষের চাপাচাপি থেকে বাঁচতে মায়ের কাছে দ্রুত বসে পরলো। তখন সেই প্রাইমারী স্কুলের স্যারটি এসেই সিট না পেয়ে আবার হাকা হাকি শুরু করে দিল। আমি সেই মহূর্তে প্রভাষক স্যারকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে আমি আর নির্বোধের মত বসে থাকতে পারলাম ন।

মনে হলো আর এক মূহুর্ত বসে থাকলে আমার জীবনের অনেক বড় একটি জিনিস হারিয়ে যাবে।তখন আমি আমার সিটটা ছেড়ে দিয়ে প্রভাষক স্যারকে বসতে দিলাম। কিন্তু স্যার আমাকে না উঠার জন্য চাপাচাপি করতে লাগলো। আর বলল, না না, উঠার দড়কার নাই, আমি

দাড়িয়ে যেতে পারবো। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে ধমক দিয়ে বলল, হে বোকা ছেলে! যে মানুষ একজন প্রভাষক হয়ে একটা হিন্দু জেলে বউকে বসতে দিলো, আর নিজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তাকে তুই সম্মান করতে শিখলি নাহ? তখন আমি তালগোল হারিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে উঠে আমার ব্যাগ হাতে নিয়ে প্রভাষক স্যারকে আমার সিটে বসার অনুরোধ করলাম। তখন স্যার নিজে না বসে প্রাইমারী স্কুলের সেই স্যারকে জোর করে বসালেন। আমি তখন স্যারের ডান পাসে স্টান্ড ধরে দাড়িয়ে রইলাম। তখন স্যার আমার মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন, বেঁচে থাক বাবা। তার পর স্যারের সাথে অপূর্ব সব কথা বার্তা বলতে বলতে কখন যে ভেওয়ামারা এসে পৌঁছে গেলাম, বুঝতেই পারলাম না। তখন স্যার কে আমার বাড়ি যাবার জন্য অনুরোধ জানালাম। স্যার খুশি হয়ে বলল, নাহ! ঠিক আছে তুমি যাও। সেদিন বাসের মধ্যে দাড়িয়ে স্যারের সাথে আমার যে অপূর্ব কথোপকথন হয়ে ছিলো তার সারমর্ম হলো এই যে,"শুধু একজন ভালো ছাত্র হওয়ার চেয়ে ভালো মানুষ হওয়াটা বেশী জরুরী। আর কিছু মানুষ তোমাকে ঠিক ততক্ষণই মূল্যায়ন করবে, যতক্ষণ

তার স্বার্থ থাকবে। স্বার্থ ও শেষ, তার কাছে তোমার ভ্যালু ও শেষ”।

সেদিন স্যারের কাছে থেকে যে শিক্ষা পেলাম তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং তিনিই হলেন আদর্শ শিক্ষক।

মোঃ নাইম আহমেদ
২য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুক্তি

দরগা মসজিদ থেকে ভেসে আসছে ফজরের আযান। পাখির কলরবে চারিদিক যেন মুখরিত। হাতে তসবি নিয়ে মসজিদের দিকে যাচ্ছে কিছু ধার্মিক মুসলমান, তারই পাশ দিয়ে বইঠা হাতে পদ্মাপারের দিকে যাচ্ছে একদল জেলে। জীবিকার টানে বিছানা ছেড়ে আসতে একটুও কুণ্ঠিতবোধ হয় নি তাদের। এ যেন পদ্মাপারের জেলেদের নিয়মিত চিত্র। কুদ্দুস মিয়া এদের দলেরই একজন। এক ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে তার ছোট সংসার। কিন্তু অভাব-অনটনে তাকে প্রায়ই ধার-দেনা করে চলতে হয়। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবন যেন বিপন্ন তার।

আজকে কুদ্দুস মিয়া একটু আগেই বের হয়েছেন। অন্যদিনের চেয়ে প্রয়োজনটা আজ বেশি তার। তার বড়ো মেয়ে জয়া অসুস্থ। আগামীকাল অপারেশনের লাস্ট ডেট। ডাক্তার বলেছেন

আজকের মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারলে তার মেয়েকে বাচানো সম্ভব হবে না।
এদিকে ঘরে চাল/ডালও কিছু নেই। দুদিন হলো প্রায় অনাহারেই দিন কাটছে তার পরিবারের। আকাশভাঙা চিন্তা নিয়ে কুদ্দুস মিয়া জাল ফেলছেন কিন্তু জালে মাছ ধরছে না। মাছগুলো আজ কেমন যেন অচেনা হয়ে গেছে ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে। হালকা রোদের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবুও কুদ্দুস মিয়া থেমে নেই। এমন সময় তার ছেলে কিরণ এসে বলছে,
-আব্বা! বেলা উইঠা গেছে। বাজারে লন। তাছাড়া বেশি দামে মাছ বেচবার পারুম না।
এ কথা শুনে শ্মশানচারী আত্মাটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠল কুদ্দুস মিয়ার। কষে এক চড় দিলেন তার ছেলেকে।তারপর বলে উঠলেন,
-চইলা যা আমার চোখের সামনে থেইকা। তুই আইসোস বইলাই মাছ পাই নাই। খোদা আমার ঘরে জালেম জন্মাইছে। এসব বলে নিজেকে একটু সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন কুদ্দুস মিয়া। কিন্তু নিদারুণ এক ব্যাথা তাকে বারবারই মনে করিয়ে দিচ্ছে সে একজন কাপুরুষ। যে নিজের মেয়ের

চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে পারে না। পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারে না, দুবেলা খাবার জোটাতে পারে না। তার এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। তার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। খোদা গরীবের ঘরে এতো রোগবালাই কেন'ই বা দেয়। তার কি কোনো মায়াদয়া নেই?

ওদিকে চোখ মুছতে মুছতে কিরণ বাড়ির পথে হাটছে। মনে মনে সে বাবাকে অনেক গালি দিচ্ছে। তারও স্রষ্টার ওপর অনেক ক্ষোভ। খোদা কেন তাকে এতো গরীব ঘরে জন্ম দিলো? কেন বড়লোকের ঘরে জন্ম দিল না? নানাপ্রশ্নে ছলছল চোখে কিরণ আজ বড়োই কাতর।

সকালের সূর্যটা গড়িয়ে দুপুর হয়ে আসছে। তবুও কিরণ তার বাবার পথ চেয়ে আছে। কখন সে বাজারে গিয়ে মাছ বিক্রি করবে? কখন সে চাল/ডাল কিনে আনবে? কখন সে একটু পেটপুরে খাবে? বাজারের পাশে একটা মস্ত বড়ো বট গাছের নিচে কিরণ বসে আছে তার বাবার অপেক্ষায়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম খেলায় তার

অপেক্ষা যে আজ দীর্ঘ হতে চলেছে সেদিকে তার কোনো নজর নেই। দুপুর গড়িয়ে বিকেল পেড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। তবুও একবুক আশা নিয়ে কিরণ বসে আছে। কিন্তু ওদিকে হয়তো মুক্তির উপায় খুঁজতে অজানাতে পাড়ি জমিয়েছেন কুদ্দুস মিয়া। কুদ্দুস মিয়াকে আর কখনো এ পথ দিয়ে ফিরতে দেখা যায় নি।

নিয়াজ মোর্শেদ হিমু
৩য় বর্ষ, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী কলেজ।

চিত্রকর্ম

নুরজাহান নূর
২য় বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নুরজাহান নূর
২য় বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইমু গুপ্তা

শাপলা আক্তার
১ম বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

জৈতা ইসলাম সাওলী
৬ষ্ঠ শ্রেনি, সৃজনী বিদ্যানিকেতন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়,
পটুয়াখালী।

সমাপ্ত

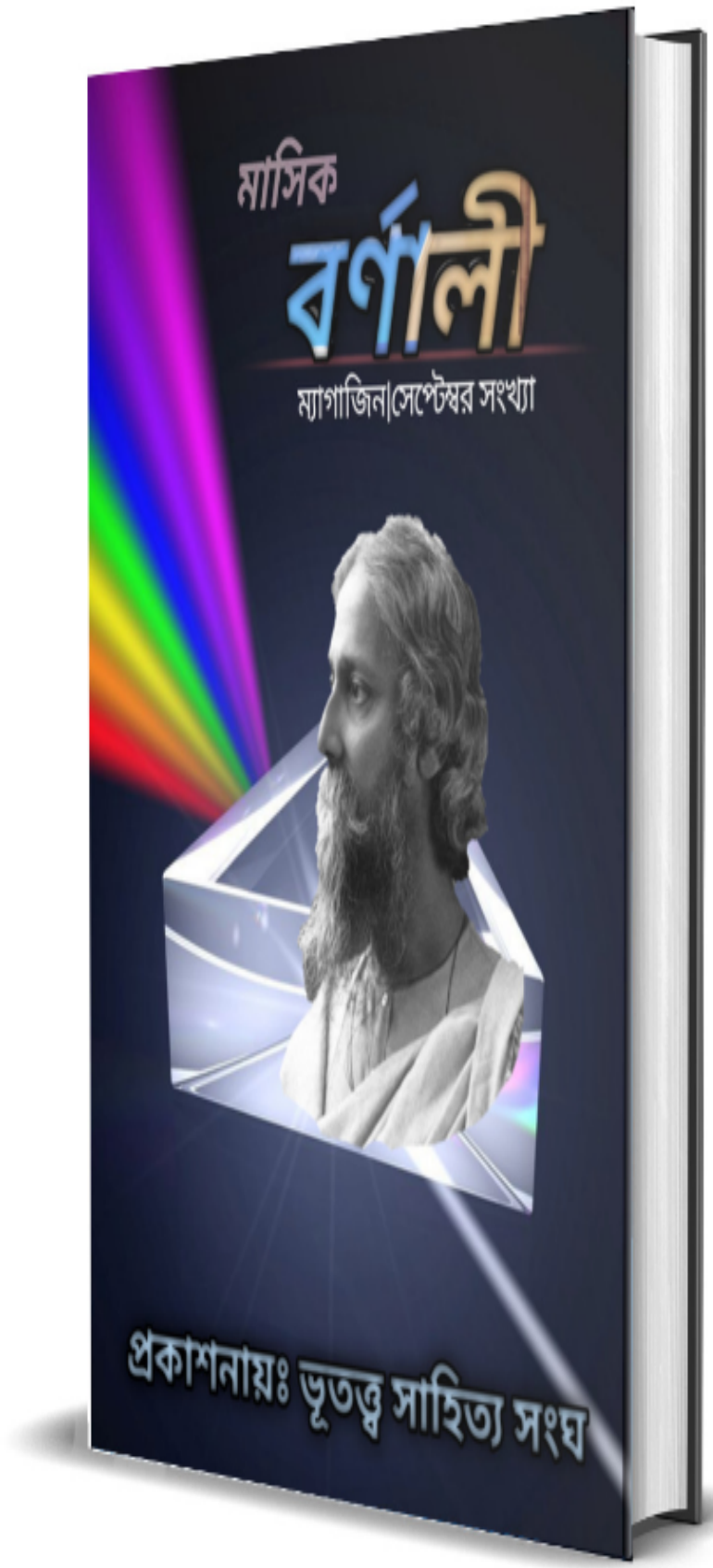
মাসিক
বর্ণালী
ম্যাগাজিন|সেপ্টেম্বর সংখ্যা
প্রকাশনায়ঃ ভূতত্ত্ব সাহিত্য সংঘ